অর্থ, ব্যাংক এবং আর্থিক নীতি

Money, Bank and Monetary Policy

৭

ভূমিকা

Introduction

অর্থ প্রচলনের পূর্বে সমাজে বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। মানুষ তার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করতে পারত না। মানুষ যে সকল দ্রব্য উৎপাদন করতে পারত, সেগুলোই একটির পরিবর্তে অন্যটি বিনিময় করত। সেটি ছিল বিনিময় প্রথা। এই প্রথার বিভিন্ন অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। যেমন: অভাবের অসামঞ্জস্যতা, দ্রব্যের অবিভাজ্যতা, মূল্য পরিমাপের অসুবিধা, সঞ্চয়ে অসুবিধা, ঋণ পরিশোধে অসুবিধা ইত্যাদি। বিনিময় প্রথার সেসব অসুবিধা দূর করার জন্যই অর্থের আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে অর্থ ছাড়া কোনো দেশকে কল্পনাই করা যায় না। অর্থ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে তথা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনাকে ব্যাপক সহজতর করেছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৭.১: অর্থ ও অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব
পাঠ ৭.২: অর্থের বিভিন্ন ধারণা
পাঠ ৭.৩: ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি
পাঠ ৭.৪: আর্থিক নীতি

পাঠ-৭.১ অর্থ ও অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব
Money and Quantity Theory of money

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থের সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
- অর্থের কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- অর্থের দ্বারা সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ বুঝতে পারবেন;
- ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

অর্থের সংজ্ঞা
Definition of Money

যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত তা-ই অর্থ। অর্থের মাধ্যমে সকল প্রকার দেনাপাওনা ও লেনদেনের হিসাব সম্পন্ন করা যায়। আধুনিক অর্থনীতি অর্থনির্ভর। তাই বর্তমান সমাজে অর্থ একটি অপরিহার্য উপাদান। অর্থকে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমনঃ

অর্থনীতিবিদ ক্রাউথারের মতে, "অর্থ এমন এক বস্তু, যা বিনিময়ের মাধ্যম এবং মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণীয়।"

অর্থনীতিবিদ সেয়ার্স -এর মতে, "দেনা-পাওনা মেটানোর কাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত কোনো বস্তুকে অর্থ বলে।"

অর্থনীতিবিদ ওয়াকার বলেন, "অর্থ যা করে তা-ই অর্থ।"

রবার্টসনের মতে, "দ্রব্যসামগ্রীর দাম এবং অন্যান্য ব্যবসাগত কার্যকলাপের পাওনা হিসেবে যা সর্বত্র গ্রহণযোগ্য তাই অর্থ।"

লর্ড কেইনসের মতে, "যে বস্তু হস্তান্তর করে ঋণ ও দামের চুক্তি মেটানো যায় এবং যার মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখা যায় তা-ই অর্থ।"

সুতরাং বলা যায়, যা বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের বাহন, ঋণ পরিশোধের উপায় হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও স্বীকৃত এবং সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য তা-ই অর্থ।

অর্থের কার্যাবলী
Functions of Money

অর্থ প্রচলনের শুরুর দিকে তা মূলত বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু, পরবর্তীতে উৎপাদন, বিনিময় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে অর্থের কার্যাবলীর পরিধি ব্যপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন অর্থ বিভিন্ন বানিজ্যিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কাজ করে থাকে। নিম্নে অর্থের কার্যাবলী বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হলো।

ক) অর্থের বাণিজ্যিক কার্যাবলী

নিম্নে অর্থের প্রধান বাণিজ্যিক কার্যাবলী আলোচনা করা হলো:

১. **বিনিময়ের মাধ্যম:** অর্থের প্রধান ও প্রথম কাজ হলো অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম। অর্থ প্রচলনের পূর্বে দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল। কিন্তু, এই প্রথার অসুবিধা ছিলো অনেক। ক্রেতা ও বিক্রেতার অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে

বিনিময় সম্ভব হতো না। অর্থ প্রচলনের পর থেকে এই অসুবিধা দূর হয়েছে। বর্তমানে মানুষ পণ্য বিনিময় না করে অর্থের সাথে পণ্য লেনদেন করে। তারপর সেই অর্থ দিয়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে। সুতরাং অর্থ বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

২. **মূল্যের পরিমাপক:** বর্তমানে সকল প্রকার পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য কী পরিমাণ পাওয়া যাবে তা অর্থের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এভাবে অর্থ বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য পরিমাপের সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে।

৩. **সঞ্চয়ের বাহন:** অর্থ সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে। মানুষ তার আয়ের সবটুকুই ব্যয় করে না। বর্তমান আয়ের একটি অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করা সহজ। এক্ষেত্রে অর্থের কোনো বিকল্প নেই। এ জন্যই মানুষ তার উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে তা অর্থের মাধ্যমে ধরে রাখে। এভাবে অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।

৪. **ভবিষ্যৎ দেনাপাওনার মান নির্দেশক:** অর্থ মানুষের ভবিষ্যৎ দেনাপাওনার মান নির্দেশক হিসেবে অর্থ কাজ করে। আধুনিককালে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বড় অংশ ঋণের মাধ্যমে কিংবা ধারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল দেনাপাওনার হিসাব অর্থের মাধ্যমেই করা হয়। এর একটি কারণ হলো দ্রব্যমূল্য খুব দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়। আর অর্থের মূল্য খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয় না।

৫. **মূল্য স্থানান্তরের মাধ্যম:** অর্থনীতিতে অনেক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে যেগুলো স্থানান্তরযোগ্য নয়। অর্থের মাধ্যমে এ সকল সম্পদের ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব অর্থাৎ মালিকানা পরিবর্তন সম্ভব। এভাবে অর্থ দ্রব্য এবং সম্পত্তির মূল্য স্থানান্তরের মাধ্যম বা বাহন হিসেবে কাজ করে।

৬. **ঋণপত্রের ভিত্তি:** আধুনিককালে ব্যবসা-বাণিজ্যে লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক ধরণের ঋণপত্রের ব্যবহার হচ্ছে। যেমন: চেক, ব্যাংক ড্রাফ্ট, হুন্ডি ইত্যাদি। ব্যাংকে জনগণের আমানত হিসাবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই এসকল ঋণপত্র ইস্যু করা হয়ে থাকে। এসব ঋণপত্র লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই বলা যায় অর্থ ঋণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৭. **তারল্যের মান:** অর্থ দ্বারা যেকোনো সময় যে কোনো দ্রব্য ক্রয় করা যায়। তাই আধুনিককালে অর্থ সবচেয়ে তরল সম্পদ হিসেবে পরিগণিত। কারণ অর্থ সকলের নিকট খুবই গ্রহণীয়। এভাবে অর্থ তারল্যের মান হিসেবে কাজ করে।

৮. **বণ্টনের ক্ষেত্রে:** আমরা জানি, উৎপাদনের চারটি উপাদান রয়েছে। যথা: ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন। এদের পারিশ্রমিক যেমন ভূমির জন্য খাজনা, শ্রমের জন্য মজুরি, মূলধনের সুদ এবং সংগঠকের মুনাফা অর্থের মাধ্যমেই বণ্টন করা হয়। এভাবে অর্থ আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ) সামাজিক কাজ: মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মানুষের বিভিন্ন ধরেণের কার্যাবলী সহজতর করার জন্যই অর্থের আবিষ্কার হয়েছে। মানুষের বিভিন্ন প্রকার সামাজিক আচার অনুষ্ঠান যেমন- বিয়ে, জন্মদিন, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপহারসামগ্রী প্রদানে অর্থ ব্যবহার করা হয়। এভাবে অর্থ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজ করে।

গ) মনস্তাত্ত্বিক কাজ: বর্তমানে অর্থ মর্যাদার বাহন হিসেবে কাজ করে। যাদের বেশি অর্থ রয়েছে তারা সমাজে ধনী হিসেবে পরিচিত। তাদের সমাজ আলাদাভাবে মূল্যায়ন করে। তথাকথিত ধনী মানুষের সামাজিক মর্যাদা বেশি। এ ছাড়া অর্থ মানুষকে উৎফুল্ল করে, চিন্তামুক্ত করে। অর্থ হাতে থাকলে মানুষ বিপদ আপদ মোকাবিলা করার শক্তি পায়। এভাবে অর্থ মানুষের বিভিন্ন প্রকার মনস্তাত্ত্বিক শক্তি জুগিয়ে থাকে।

অর্থের দ্বারা সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ

Demerits of Created by Money

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অর্থ সমাজের নিরঙ্কুশ আশীর্বাদ। কারণ অর্থ ছাড়া মানবসভ্যতার এত বিকাশ হতো না। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে অর্থ তার কর্ম সম্পাদনকালে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি করে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. **শ্রেণী বৈষম্য :** অর্থের দ্বারা সমাজে শ্রেনি বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সমাজে কেউ অনেক অর্থের মালিক হয়ে যায় আবার কেউ চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়। এতে সমাজে বিভিন্ন অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সমাজে আয়বৈষম্য বহু সমস্যার জন্ম দেয়।

২. **মুদ্রাস্ফীতি:** বর্তমানে প্রায় প্রতিটি অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এটি একটি বড় সমস্যা। এক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় আর অর্থের মূল্য হ্রাস পায়। অন্যভাবে বলা যায়, যখন উৎপাদিত দ্রব্যসমাগ্রীর তুলনায় অর্থের যোগান বেশি হয়ে পড়ে তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৩. **মুদ্রা সংকোচন:** মুদ্রাস্ফীতির ঠিক উল্টো দিকটিই মুদ্রা সংকোচন। এক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যসমাগ্রীর তুলনায় অর্থের যোগান কম হয়। এ সময় দ্রব্যের দাম হ্রাস পায়। এটিও অর্থনীতিতে কাম্য নয়। এ অবস্থায় দেশে বিনিয়োগ হ্রাস পায় এবং উৎপাদন কমতে থাকে। ফলে বেকারত্ব বেড়ে যায়। কাজেই অর্থ অনেক সময় অর্থনীতির সমস্যার কারণ হিসেবে দেখা দেয়।

৪. **জাল অর্থের প্রচলন:** অর্থ প্রচলন হয়েছে বলেই এক শ্রেণির অসাধু মানুষ জাল অর্থ তৈরী করে। এরা মানুষকে প্রতারিত করে এবং দেশের অর্থব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করে।

৫. **নৈতিক অধঃপতন:** অতিরিক্ত অর্থ অনেক সময় মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় করে। অর্থের দাম্ভিকতায় মানুষ মানুষকে চেনে না। অনেক সময় ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং বিবেক হারিয়ে ফেলে। মানুষের নৈতিক অধঃপতন হয় অর্থের জন্যই। এ জন্যই বলা হয় অর্থই অনর্থের মূল।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থ যেমন মানুষকে সমৃদ্ধি দিয়েছে তেমন অনেক অসুবিধারও জন্ম দিয়েছে।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

Quantity Theory of money

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আরভিং ফিশার ১৯১১ সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থে অর্থের পরিমাণ, দামস্তর এবং অর্থের মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে একটি সমীকরণ ব্যবহার করেন। এ সমীকরণটিকে তার নামানুসারে ফিশারীয় বিনিময় সমীকরণ বলা হয়। কেবল লেনদেনের প্রয়োজনেই অর্থের চাহিদার উৎপত্তি হয় এ ধারণার ভিত্তিতে সমীকরণটি রচিত বলে একে নগদ লেনদেন ভাষ্যও বলা হয়। অর্থের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে যে সকল তত্ত্ব বা মতবাদ প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে ফিশারের তত্ত্বটি সর্বধিক পরিচিত।

তত্ত্বটির মূল বক্তব্য: অর্থের মূল্য সমাজে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে, মূল্যস্তর সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় এবং অর্থের মূল্য সেই অনুপাতে হ্রাস পায়। আবার, অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে হ্রাস পায়, মূল্যস্তর সেই অনুপাতে হ্রাস পায় এবং অর্থের মূল্য সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

তত্ত্বটির অনুমিত শর্ত: তত্ত্বটি দুটি অনুমিত শর্তের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। শর্ত দুটি হলো ঃ

১. দ্রব্যের মেটি চাহিদা এবং মোট যোগানের মধ্যে সর্বদা ভারসাম্য বজায় থাকে।
২. সমাজে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বিদ্যমান।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ফিশারের সমীকরণটি নিম্নরূপ:

$$MV = PT$$

অথবা, $P = MV/T$

এখানে, P = মূল্যস্তর

M = অর্থের পরিমাণ

V = অর্থের প্রচলন গতি

T = নির্দিষ্ট সময়ে লেনদেনযোগ্য দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ

উপরের সমীকরণে দ্বারা MV কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের মোট যোগান নির্দেশ করছে। অপরদিকে PT দ্বারা মোট অর্থের চাহিদা প্রকাশ করা হয়েছে। সমীকরণ হতে জানা যায়, ফিশারের মতে MV = PT অর্থাৎ অর্থের যোগান = অর্থের চাহিদা। তিনি মনে করেন, V ও T স্থির থাকলে যদি M একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তিত হয় তবে দামস্তর (P) একই অনুপাতে পরিবর্তিত হবে।

ফিশারের মূল সমীকরণে কেবল বিহিত মুদ্রাকে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু, আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের যোগান বলতে কেবল কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণকে বুঝায় না; বরং ব্যাংকের সৃষ্ট অর্থ বা ঋণপত্র এবং তার প্রচলন গতিও অর্থের যোগানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এজন্য পরবর্তিকালে ফিশারের সমীকরণটির সংশোধিত রূপ প্রদান করা হয় যা নিম্নরূপঃ

$$MV = PT + M'V'$$

অথবা, $P = (MV + M'V') / T$

এখানে, P = মূল্যস্তর

M = অর্থের পরিমাণ

V = অর্থের প্রচলন গতি

M′ = ঋণপত্রের পরিমাণ

V′ = ঋণপত্রের প্রচলন গতি

T = নির্দিষ্ট সময়ে লেনদেনযোগ্য দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ

ফিশারের মতে, V, V′ এবং T স্বল্পকালে অপরিবর্তিত থাকে। কারণ, অর্থের প্রচলন গতি সাধারণতঃ মানুষের স্বভাব ও ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি-নীতির ওপর নির্ভর করে যেগুলো স্বল্পকালে পরিবর্তিত হয় না। আবার, মোট ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ভর করে জনসংখ্যার আয়তন, মাথাপিছু আয়, মানুষের ভোগ-অভ্যাস, রুচি প্রভৃতির ওপর। স্বল্পকালে এগুলোও খুব বেশি পরিবর্তিত হয় না।

কাজেই V, V′ এবং T অপরিবর্তিত থেকে M ও M′ পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যস্তর (P) একই অনুপাতে একই দিকে পরিবর্তিত হয় এবং অর্থের মূল্য বিপরীতভাবে সমহারে পরিবর্তিত হয়। এটিই হলো ফিশারীয় সমীকরণের মূল বক্তব্য।

গানিতিক ব্যাখ্যা: ধরা যাক,

$M = ৭৫, V = ২,$

$M' = ২৫, V' = ২$ এবং $T = ১০$

সুতরাং,

$P = (MV + M'V') / T$

$= (৭৫ \times ২ + ২৫ \times ২) / ১০$

$= ২০$

এখন, V, V′ এবং T স্থির থেকে যদি M ও M′ পরিমাণ দ্বিগুণ হয় তবে,

$P = (MV + M'V') / T$

$= (১৫০ \times ২ + ৫০ \times ২) / ১০$

$= ৪০$

উপরের হিসেবে দেখা যায়, অর্থের যোগান দ্বিগুণ হওয়ায় মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু, অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়েছে। এভাবে ফিশারের সমীকরণটি তথা অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা যায়।

চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ

ফিশারের লেনদেন ভাষ্যটি চিত্রের সাহায্যেও ব্যাখ্যা করা যায়। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করা হলোঃ

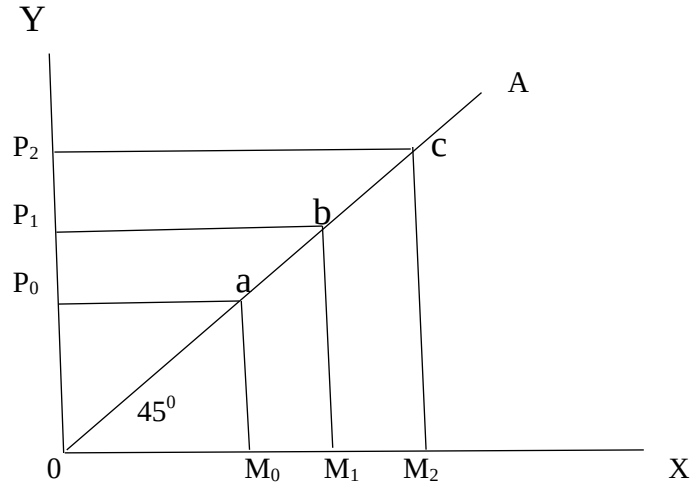

চিত্রের OX অক্ষে অর্থের পরিমাণ এবং OY অক্ষে মূল্যস্তর নির্দেশিত। চিত্রে দেখা যায়, অর্থের পরিমাণ OM থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OM_2 তে বৃদ্ধির সাথে সাথে মূল্যস্তরও একই হারে P_0 থেকে P_2 তে প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে, অর্থের পরিমাণ ও মূল্যস্তরের সম্পর্কসূচক a,b,c বিন্দুগুলো যোগ করে OA রেখা পাওয়া যায় তা ৪৫° রেখা ধারণ করেছে যা

দেখাচ্ছে, অর্থের পরিবর্তনের ফলে দামস্তরের পরিবর্তন সমানুপাতিক। এভাবে অর্থের পরিমাণের ফিশারীয় সমীকরণটি ব্যাখ্যা করা যায়।

সমালোচনা

তত্ত্বটি বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছেঃ নিম্নে তত্ত্বটির কিছু সমালোচনা উল্লেখ করা হলোঃ

১. তত্ত্বটির অনুমিতিগুলো অবাস্তব।
২. তত্ত্বটিতে অর্থের চাহিদার অপূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে।
৩. তত্ত্বটিতে অর্থের চাহিদার চেয়ে অর্থের যোগানের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
৪. পূর্ণ নিয়োগের অনুমিতি যুক্তিযুক্ত নয়।

মূল্যস্তর বৃদ্ধির অন্যান্য কারণকে অবহেলা করা হয়েছে ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ

- অর্থ এমন এক বস্তু, যা বিনিময়ের মাধ্যম এবং মুল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণীয়।
- অর্থ বিভিন্ন বাণিজ্যিক, সামাজিক ও মনস্তাত্বিক কাজ করে থাকে।
- অর্থের পরিমাণের ফিশারীয় সমীকরণ অনুযায়ী অর্থের মূল্য সমাজে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণ দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

পাঠ-৭.২ বিভিন্ন প্রকার অর্থের ধারণা
Concepts of Different types of Money

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন প্রকার অর্থের বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন অর্থের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিভিন্ন প্রকার অর্থ
Different Types of Money

একটি দেশে প্রচলিত অর্থের প্রকারভেদ রয়েছে। আবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার অর্থের প্রচলন আছে। অর্থ যে রূপেই থাকুক না কেন তা সবসময় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেই কাজ করে।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার অর্থ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

১. **বিহিত মুদ্রা ঃ** যে অর্থ সরকারের অনুমোদনক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে জনগণ গ্রহণ করতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে। যেমন: কাগজী মুদ্রা, বিভিন্ন ধাতব মুদ্রা ইত্যাদি। আমাদের দেশে প্রচলিত ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ২০০ টাকা ৫০০ টাকা এবং ১০০০ টাকার কাগজী নোট এবং সকল প্রকার ধাতব মুদ্রা হলো বিহিত মুদ্রা।

২. **হিসাবী অর্থ ঃ** অর্থের যে নাম বা উপাধিতে দেশের হিসাব-নিকাশ করা হয় এবং লেনদেন কার্যক্রম সম্পন্ন হয় সেই নামকে হিসাবী অর্থ বলা হয়। যেমন: বাংলাদেশে টাকা, ভারতে রূপি, সৌদি আরবে রিয়েল, জাপানে ইয়েন, আমেরিকায় ইউএস ডলার ইত্যাদি।

৩. **প্রকৃত মুদ্রা ঃ** যে অর্থের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক লেনদেন কাজ সম্পন্ন হয় তাকে প্রকৃত মুদ্রা বলে। প্রকৃত মুদ্রা দুই প্রকার। যথা: ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রা। বাংলাদেশে ১ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত সকল প্রকার ধাতব ও কাগজী নোট হলো প্রকৃত মুদ্রা।

৪. **ঐচ্ছিক মুদ্রা ঃ** যে সকল অর্থ লেনদেনে কাজে সহায়ক এবং কিন্তু লেনদেনের কাজে কেউ গ্রহণ করতে বাধ্য নয় সেগুলোকে ঐচ্ছিক মুদ্রা বলে। যেমন: চেক, প্রাইজ বন্ড ইত্যাদি।

৫. **প্রতীক মুদ্রা ঃ** যে অর্থের দৃশ্যমান মূল্য তার অন্তর্নিহিত বা ধাতব মূল্যের চেয়ে বেশি থাকে তাকে প্রতীক মুদ্রা বলে। এই মুদ্রাকে নির্দেশক মুদ্রাও বলা হয়।

৬. **প্রামাণিক মুদ্রা ঃ** যে অর্থের দৃশ্যমান মূল্য তার ধাতব মূল্যের সমান হয় তাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলে। অর্থাৎ প্রামাণিক মুদ্রা গলিয়ে ধাতু হিসেবে বিক্রি করলে মুদ্রার সমপরিমাণ দাম পাওয়া যায়।

৭. **আদিষ্ট মুদ্রা ঃ** যে মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই, কিন্তু, সরকারি নির্দেশে জনগণ লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্যবাধকতায় থাকে তাকে আদিষ্ট মুদ্রা বলে। যেমন: অর্থনীতিতে প্রচলিত কাগজী নোটকে আদিষ্ট মুদ্রা বলে।

৮. **ব্যাংক মুদ্রা ঃ** বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করার জন্য ব্যাংকসমূহ যেসব ঋণপত্র ইস্যু করে তাদের ব্যাংক মুদ্রা বলে। যেমন: চেক, ব্যাংক ড্রাফ্ট, পে অর্ডার ইত্যাদি।

৯. **প্রায় মুদ্রা ঃ** যেসব মুদ্রা খুব সহজেই অর্থে রূপদান করা সম্ভব তাদের প্রায় মুদ্রা বলে। এগুলো সরাসরি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় না কিন্তু প্রয়োজনবোধে সহজেই অর্থে রূপান্তর করা যায়। যেমন: প্রাইজ বন্ড, ট্রেজারি বিল, সঞ্চয়পত্র, সরকারি বন্ড ইত্যাদি প্রায় মুদ্রার উদাহরণ।

সংকীর্ণ অর্থ এবং বিস্তৃত অর্থ

Narrow money and Broad money

অর্থকে সংকীর্ণ এবং বিস্তৃত অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

সংকীর্ণ অর্থ ঃ জনগণের হাতের নগদ অর্থ এবং ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানতের সমষ্টি হলো সংকীর্ণ মুদ্রা। সংকীর্ণ মুদ্রাকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা হয়: $M_1 = C + D$ যেখানে, M_1 = সংকীর্ণ মুদ্রা, C = জনগনের হাতের নগদ অর্থ এবং D = বানিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত।

বিস্তৃত অর্থ ঃ সংকীর্ণ অর্থ এবং ব্যাংকের মেয়াদি আমানতের সমষ্টি হলো বিস্তৃত অর্থ বা বিস্তৃত মুদ্রা। অর্থাৎ $M_2 = M_1 + T$ যেখানে, M_2 = বিস্তৃত মুদ্রা, $M_1 = C + D$ এবং T = মেয়াদি আমানত।

সংকীর্ণ অর্থ এবং বিস্তৃত অর্থের পার্থক্য

Difference between Narrow money and Broad money

সংকীর্ণ ও ব্যপক বা বিস্তৃত মুদ্রার অনেকগুলো পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপ-

১. সংকীর্ণ অর্থের সমীকরণ হলো $M_1 = C + D$ । অপরদিকে বিস্তৃত অর্থের সমীকরণ হলো $M_2 = M_1 + T$ ।

২. সংকীর্ণ অর্থ যেকোনো সময় লেনদেন ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু, বিস্তৃত অর্থের মেয়াদি আমানত যেকোনো সময় বিনিময়ের মাধ্যম তথা লেনদেনের কাজে ব্যবহার করা যায় না।

৩. সংকীর্ণ অর্থের তারল্যতা অনেক বেশি। পক্ষান্তরে, বিস্তৃত অর্থের তারল্যতা অপেক্ষাকৃত কম। এজন্য ব্যবহারগত দিক হতে বিস্তৃত অর্থের তুলনায় সংকীর্ণ অর্থের ধারণা অধিকতর জনপ্রিয়।

৪. বিস্তৃত অর্থের মেয়াদি আমানতকে অর্থে রূপান্তর করতে অনেক সময় কিছু ব্যয় হয়ে থাকে। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো প্রকার নগদ অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন পড়ে না।

৫. মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে সংকীর্ণ অর্থের গুরুত্ব বেশি। অপরদিকে জাতীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিশেষ করে আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিস্তৃত অর্থের গুরুত্ব বেশি। মিল্টন ফ্রিডম্যান, এন্ডারসন প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণের গবেষণায় এমনটি বেরিয়ে এসেছে।

সুতরাং দেখা যায় সংকীর্ণ ও বিস্তৃত মুদ্রা একটি অপরটির পরিপূরক। কারণ বিস্তৃত মুদ্রার একটি অংশ হলো সংকীর্ণ মুদ্রা।

শক্তিশালী মুদ্রা

Strong money

একটি দেশের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত সকল প্রকার মুদ্রা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত অন্যান্য ব্যাংকের রিজার্ভের সমষ্টিকে শক্তিশালী মুদ্রা বলা হয়।

শক্তিশালী মুদ্রার সূত্রটি হলো: $B = C + R$

যেখানে, B = শক্তিশালী মুদ্রা, C = কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত মুদ্রা, R = কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত অন্যান্য ব্যাংকের রিজার্ভের পরিমাণ।

শক্তিশালী মুদ্রার পরিমাণ নির্ভর করে দেশের আর্থিক নীতির উপর। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে শক্তিশালী মুদ্রার পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারে। শক্তিশালী মুদ্রা মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ যা একটি দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি।

কাগজী মুদ্রা

কাগজী মুদ্রা হলো দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজের নোট। একটু স্পষ্ট করে বলা যায়, যখন কোনো একটি দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কতগুলো বিধি ব্যবস্থার আদলে কাগজের নোট মুদ্রা হিসেবে অর্থ বাজারে প্রচলন করে তখন তাকে কাগজী নোট বলে। যেমন: বাংলাদেশে ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ২০০ টাকা, ৫০০ টাকা এবং ১০০০ টাকার কাগজী নোট প্রচলিত আছে।

কাগজী মুদ্রার প্রকারভেদ

কাগজী মুদ্রা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এ মুদ্রাকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয় যা নিচে আলোচিত হলো।

১. **প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্রা ঃ** কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগজী মুদ্রা চালু করা হলে যদি তার সমপরিমাণ ধাতব পদার্থ (যেমন: স্বর্ণ বা রৌপ্য) রিজার্ভ বা গচ্ছিত রাখা হয় তখন তাকে প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্রা বলে।

২. **পরিবর্তনশীল কাগজী মুদ্রা ঃ** যদি কাগজী মুদ্রাকে ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন করা যায় অর্থাৎ যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনসাধারণকে চাহিবামাত্র কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে ধাতব মুদ্রা প্রদানে সক্ষম হয় তবে তাকে পরিবর্তনশীল কাগজী মুদ্রা বলে। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার কাগজী নোটগুলো পরিবর্তনশীল কাগজী মুদ্রার উদাহরণ।

৩. **অপরিবর্তনশীল কাগজী মুদ্রা ঃ** যদি সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজী মুদ্রার সমপরিমাণ ধাতব মুদ্রা প্রদানে বাধ্য না থাকে তবে তাকে অপরিবর্তনশীল কাগজী মুদ্রা বলে। বাংলাদেশ সরকারের দুই টাকার নোট এ ধরনের মুদ্রা।

সারসংক্ষেপ

- যে অর্থ সরকারের অনুমোদনক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে জনগণ গ্রহণ করতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকে তাকে বিহিতমুদ্রা বলে।
- জনগণের হাতের নগদ অর্থ এবং ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানতের সমষ্টি হলো সংকীর্ণ মুদ্রা।
- সংকীর্ণ অর্থ এবং ব্যাংকের মেয়াদি আমানতের সমষ্টি হলো বিস্তৃত অর্থ বা বিস্তৃত মুদ্রা।

পাঠ-৭.৩ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি
Credit Creation of Commercial Bank

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

বাণিজ্যিক ব্যাংক
Commercial Bank

ব্যাংক বলতে মূলত: বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বুঝায়। যে ব্যাংক জনগনের নিকট থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে এবং ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋন প্রদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী," যে প্রতিষ্ঠান চলতি বা অন্য কোনো হিসাবের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট থেকে অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং চেক বা আদেশপত্রের মাধ্যমে উক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।"

অধ্যাপক ডি-ককের মতে, "যে প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অর্থ এবং অর্থের মাপকাঠিতে নিরূপিত ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পন্ন করার কাজে লিপ্ত থাকে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে ।"

অধ্যাপক আশুতোষ নাথ বলেছেন, "বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো মুনাফা অর্জনকারী একটি মধ্যস্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান।"

সুতরাং, বলা যায় বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত কম সুদে আমানত গ্রহণ করে এবং অধিক সুদে বিভিন্ন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী
Functions of Commercial Bank

আধুনিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলীকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১। সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী

২। জনহিতকর কার্যাবলী

৩। প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী

নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপরোক্ত কার্যাবলী আলোচনা করা হলো:

১। সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম এবং মৌলিক কার্যাবলীকে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী বলে। এসবের মধ্যে রয়েছে বহুবিধ কাজ যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক) আমানত গ্রহণ: বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহন করা। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তিন ধরণের আমানত গ্রহণ করে থাকে। এগুলো হলো চলতি

আমানত, সঞ্চয়ী আমানত এবং স্থায়ী আমানত। চলতি আমানতের ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহককে কোনো সুদ দেয় না। সঞ্চয়ী আমানতের জন্য সাধারণত কম হারে এবং স্থায়ী আমানতের জন্য বেশি হারে সুদ দেয়া হয়।

খ) ঋণ দান: বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ঋণ প্রদান। কারণ এই ঋণের মাধ্যমেই ব্যাংক তার প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতের সবটুকু ঋণ দিতে সক্ষম হয় না। একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে রেখে অথবা নগদ রেখে বাকি অংশ ঋণ প্রদান করতে পারে।

গ) বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা

ঘ) ঋণ আমানত সৃষ্টি করা

২। জনহিতকর কার্যাবলী

জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন রকম জনহিতকর কাজ করে থাকে। যেমন: অর্থ স্থানান্তর করা, হুন্ডি বাট্টা করা, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা প্রদান করা, মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

৩। প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের পক্ষে বাড়ি ভাড়া, আয় কর, বীমার প্রিমিয়াম, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল ইত্যাদি গ্রহণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের পক্ষ হতে শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের বহুগুণ ঋণ সৃষ্টি প্রক্রিয়া

Multiple Credit Creation of Commercial Bank

ঋণ বা আমানত সৃষ্টি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের কাছে রক্ষিত আমানতের সাহায্যে ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সাধারণত দুইভাবে আমানত সৃষ্টি করে থাকে।

প্রথমত, জনগণ বাণিজ্যিক ব্যাংকে তাদের সঞ্চয়কৃত নগদ অর্থ জমা রাখে। এতে ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ গ্রাহকদের ঋণ প্রদান করে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার নামে ব্যাংক একটি আমানত হিসাব খোলে। তারপর গ্রাহককে চেকের মাধ্যমে ঋণের টাকা ওঠানোর সুযোগ সৃষ্টি করে। এভাবে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি পায়।

অর্থনীতিবিদ হার্টলি উইদার্স বলেছেন, "ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।" অর্থাৎ ঋণ প্রদান করা হলে ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি পায়।

তবে ড. ওয়াটার লীফ এবং প্রফেসর ক্যানান এই মতবাদের সমালোচনা করেছেন। তারা মনে করেন, ব্যাংক ঋণ প্রদান করলে আমানত বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে এটি ঠিক নয়। বিষয় হলো আমানতকারীরা বা জমাকারীরা একসাথে তাদের টাকা তোলে না। ফলে ব্যাংক আমানতের একটি অংশ ঋণ হিসেবে প্রদান করতে পারে। সুতরাং বলা যায় ঋণ দেওয়ার ফলে আমানত সৃষ্টি হয় না। বরং আমানত সম্পূর্ণ না তোলার জন্য ব্যাংক ঋণ দিতে সক্ষম হয়। উল্লেখ করা যায়, তারা যে কথা বলেছেন তা একটি একক ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোনো একটি একক ব্যাংক আমানতের নির্দিষ্ট অংশের বেশি ঋণ বা ধার দিতে পারে না। কিন্তু একাধিক ব্যাংক সম্মিলিতভাবে অনেক বেশি আমানত বা ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদ পল এ স্যামুয়েলসন বলেছেন, ক্ষুদ্র একক ব্যাংকের দ্বারা আমানত সৃষ্টি সীমাবদ্ধ হতে পারে কিন্তু সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা প্রাপ্ত আমানতের কয়েকগুন বেশি আমানত সৃষ্টি করতে পারে যা ক্ষুদ্র ব্যাংকের একক ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকে বহুগুণিতক ঋণ বা আমানত সৃষ্টি বলে।

অনুমিত শর্তসমূহ: বাণিজ্যিক ব্যাংকের বহুগুণিতক ঋণ বা আমানত সৃষ্টি বিশ্লেষণ করতে হলে কতগুলো অনুমিত শর্ত অনুসরণ করতে হয় যা নিম্নরূপ:

১. ব্যাংকের মাধ্যমে সকল প্রকার আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়।
২. দেশে একাধিক ব্যাংক কর্মরত রয়েছে।
৩. প্রতিটি ব্যাংক তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ রাখে।
৪. ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা তুলে তার সবটাই দ্বিতীয় ব্যাংকে জমা রাখে আবার দ্বিতীয় ব্যাংক তৃতীয় ব্যাংকে জমা রাখে।
৫. অন্য ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা যা জমা দেয় তা নিয়ে প্রতিটি ব্যাংক কাজ শুরু করে।

নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি উদাহরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো:

ধরা যাক "ক" ব্যাংকে কোনো লোক ১০০০ টাকা জমা রাখল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি অনুযায়ী এই টাকার ১০ শতাংশ রিজার্ভ সংরক্ষণ করতে হবে। এই অবস্থায় "ক" ব্যাংকের প্রাথমিক ব্যালান্স শিট হবে নিম্নরূপ:

পাওনা	দেনা
রিজার্ভ = ১০০ টাকা ঋণ = ৯০০ টাকা	চাহিদা আমানত = ১০০০ টাকা
মোট = ১০০০ টাকা	মোট = ১০০০ টাকা

দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ব্যবসায়ী ৯০০ টাকা ঋণ পেল সে ঐ টাকা অন্য কোনো একটি ব্যাংকে (খ ব্যাংক) জমা রাখলো। ফলে "খ" ব্যাংকের রিজার্ভ ৯০০ টাকা হলো এবং চাহিদা আমানত ৯০০ টাকা বাড়ল। এক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী খ ব্যাংক ৯০০ টাকার ১০% অর্থাৎ ৯০ টাকা রিজার্ভ রাখবে এবং অবশিষ্ট ৮১০ টাকা ঋণ দেবে। এ অবস্থায় খ ব্যাংকের ব্যালান্স শিট হবে:

পাওনা	দেনা
রিজার্ভ = ৯০ টাকা ঋণ = ৮১০ টাকা	চাহিদা আমানত = ৯০০ টাকা
মোট = ৯০০ টাকা	মোট = ৯০০ টাকা

একইভাবে তৃতীয় বা "গ" ব্যাংকের ব্যালান্স শিট হবে-

পাওনা	দেনা
রিজার্ভ = ৮১ টাকা ঋণ = ৭২৯ টাকা	চাহিদা আমানত = ৮১০ টাকা
মোট = ৯০০ টাকা	মোট = ৮১০ টাকা

সুতরাং ব্যাংকগুলোর সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ হলো নিম্নরূপ:

ব্যাংক	প্রকৃত আমানত	রিজার্ভের পরিমাণ	সৃষ্ট আমানত
ক	১০০০ টাকা	১০০ টাকা	৯০০ টাকা
খ	৯০০ টাকা	৯০ টাকা	৮১০ টাকা
গ	৮১০ টাকা	৮১ টাকা	৭২৯ টাকা
সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থার জন্য মোট			২৪৩৯ টাকা

বাণিজ্যিক ব্যাংক যতবার ঋণ প্রদান করে ততবারই নতুন আমানত সৃষ্টি হয়। উপরের ঋণ সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলতে চলতে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে যখন ব্যাংকের পক্ষে আর কোনো ঋণ দেয়া সম্ভব হবে না। এ অবস্থায় সমস্ত ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রাথমিক আমানতের ১০ গুণ। বিষয়টি গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

১০০০ + ৯০০ + ৮১০ + ৭২৯ + ...+ ০

= ১০০০ [১ + ৯/১০ + (৯/১০)^{২} + (৯/১০)^{৩} + ...]

= ১০০০ [১ /(১-৯/১০)]

= ১০০০ X ১০/১

= ১০০০০ টাকা

এখানে দেখা যাচ্ছে ১০ গুণ ঋণ সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, যদি বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভের পরিমাণ ৫% হতো তবে বাণিজ্যিক ব্যাংক ২০ গুণ ঋণ সৃষ্টি করতে পারত। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের প্রকৃত আমানতের বহুগুণ ঋণ বা আমানত সৃষ্টি করতে পারে।

প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক পৃথকভাবে কেবল তার নগদ সংরক্ষিত তহবিলের অতিরিক্ত যে অর্থ থাকে সেই পরিমাণ ঋণ দিতে পারে এবং তা হতে উদ্ভুত সীমিত আমানত সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু, সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের আমানতের বহুগুণ ঋণ বা আমানত সৃষ্টি করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা

Limitations of Credit Creations of Commercial Bank

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি করার ক্ষমতা অসীম নয়। ব্যাংকসমূহ ইচ্ছামতো আমানত সৃষ্টি করতে পারে না। ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন:

১. **প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ:** প্রাথমিক আমানত বা মূল আমানত বেশি না হলে ব্যাংকের আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। প্রাথমিক আমানত যত বেশি হবে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমনত বা ঋণের পরিমাণ তত বেশি হবে।

২. **রিজার্ভের হার:** রিজার্ভের হার যদি বেশি হয় অর্থাৎ তারল্য বজায় রাখার জন্য ব্যাংক যদি অধিক পরিমাণ নগদ অর্থ জমা রাখে তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমনত বা ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে পড়ে।

৩. **নগদ প্রিয়তা:** কোনো ব্যক্তি যদি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা ব্যাংকে জমা না রেখে নিজের হাতে নগদ টাকা হিসেবে ধরে রাখে তাহলে বহুগুণ ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যহত হয়।

৪. **উত্তম জামানত:** উত্তম জামানতের অভাবে ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির পরিমাণ সংকুচিত হয়ে পড়ে। ঋণ গ্রহীতার গ্রহণযোগ্য জামানত না থাকলে ব্যাংকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঋণ প্রদান করা সম্ভব হয় না।

৫. **ঋণগ্রহীতার ইচ্ছা:** ঋণ গ্রহীতার আগ্রহ না থাকলে ব্যাংক তার উপর জোড় করে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে না। কাজেই ব্যাংকের ইচ্ছা থাকলেও দেশে ঋণ গ্রহীতার অভাব থাকলে ঋণ সৃষ্টির পরিমাণ সংকুচিত হয়ে পড়ে।

৬. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেভাবে চায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সেইভাবেই পরিচালিত হয়।

৭. **ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি:** দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি তথা দেশের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির পরিমাণ নির্ভর করে। যেমন, অর্থনীতিতে মন্দা থাকলে ঋণের চাহিদা কমে যায়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য

Liquidity of Commercial Bank

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ স্থায়ী, চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে জনগণের কাছে অলসভাবে পড়ে থাকা অর্থ সুদের বিনিময়ে সংগ্রহ করে থাকে। ব্যাংক থেকে আমানতকারী যে কোনো মুহূর্তে সম্পূর্ণ বা আংশিক অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ উত্তোলণ করতে পারে। তাই ব্যাংক মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ তাদের কাছে জমা রাখে যাতে আমানতকারীদের চাহিবা মাত্র অর্থ পরিশোধ করতে পারে। আর ব্যাংকের কাছে সংরক্ষিত নগদ অর্থের এই পরিমাণকে বলা হয় তারল্য। ব্যাংকের প্রয়োজনীয় তারল্য না থাকলে সে আমানতকারীদের চাহিবামাত্র দাবি পূরণে সক্ষম হবে না। সুতরাং ব্যাংকের কাছে তারল্য নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে মোট আমানতের ২৫% তারল্য হিসাবে জমা রাখা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য সমস্যার কারণ

Causes of liquidity Probelm of Commercial Bank

বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলত জনসাধারণের আমানত নিয়ে ব্যাবসা পরিচালনা করে। কিন্তু, আমানতকারীগণ যেকোনো সময় তাদের সঞ্চয়ের টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নিতে পারে। তাই আমানতকারীদের চাহিদা পূরণ করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক যে পরিমাণ নগদ অর্থ সবসময় ব্যাংকে গচ্ছিত রাখে তাকে তারল্য বলে। বস্তুতঃ তারল্য বজায় রাখা বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। তবে অনেক সময় বিভিন্ন কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকে তারল্য সংকট দেখা দেয়। কারণগুলো নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. **অতিরিক্ত ঋণ প্রদান:** কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক যদি অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করে তবে ঐ ব্যাংকের নগদ অর্থের সংকট দেখা দিতে পারে। কারণ প্রতিটি ব্যাংকেরই মূলধন সীমিত এবং ঋণ প্রদানের ক্ষমতাও সীমিত।

২. **আমানতের প্রবাহ:** ব্যাংকে আমানত আসলে নগদ অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু কোনো কারণে মানুষ যদি ব্যাংকে অর্থ জমা করার হার কমিয়ে দেয় অর্থাৎ ব্যাংকে আমানতের প্রবাহ কমে যায় তবে ব্যাংকে তারল্য সংকট দেখা দেয়। যেমন: নিরাপত্তার অভাব, সুদের হার কমে যাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ব্যাংকে আমানত প্রবাহ কমে যেতে পারে।

৩. **খেলাপি ঋণ:** যেকোনো দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হচ্ছে খেলাপি ঋণ। ঋণগ্রহীতাগণ যদি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সময়মতো ফেরত না দেয় তবে তাকে খেলাপি ঋণ বলে। এই ঋণের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে ব্যাংকে নগদ টাকার সংকট বা তারল্য সংকট দেখা দেয়।

৪. **অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন:** আমানতকারীরা যদি হঠাৎ করেই জমাকৃত টাকা বেশি বেশি উত্তোলন করে তবে ব্যাংকে নগদ অর্থের সংকট হতে পারে। অর্থের নিরাপত্তার অভাব, বেশি মুনাফার বিনিয়োগের ক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়া, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি কারণে আমানতকারীরা একযোগে ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলণ করতে পারে।

উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকে তারল্য সংকট দেখা দিতে পারে।

তারল্য সংকট সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ

Ways of Solving Liquidity Problem

বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন:

১. ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ এমনভাবে রাখতে হবে যাতে সংকটের সময় সহজেই তা নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায়।

২. স্বল্প নোটিশে উত্তোলনযোগ্য অর্থ ব্যাংকের থাকতে হবে, যাতে করে ব্যাংক জরুরি ভিত্তিতে চাহিদা মেটানোর জন্য তা ব্যবহার করতে পারে যা তারল্য সংকট সমাধানে সাহায্য করতে পারে।

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে ট্রেজারি বিল ও অন্যান্য ঋণপত্র থাকে। এগুলোর পুনঃবাট্টার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে নগদ অর্থে রূপান্তর করা সম্ভব।

৪. তারল্য-মুনাফা অনুপাত বজায় রেখে ব্যাংকের ব্যবসা তথা ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত, যাতে অর্থ অলস পড়ে না থাকে আবার গ্রাহককে চাহিবামাত্র অর্থ ফেরত দেয়া যায়।

৫. খেলাপী ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়াও নতুন করে যাতে খেলাপি ঋণ সৃষ্টি না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এভাবে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা নিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তারল্য সংকট মোকাবেলা করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

- যে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অর্থ এবং অর্থের মাপকাঠিতে নিরূপিত ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পন্ন করার কাজে লিপ্ত থাকে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে ।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরণের হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তিন ধরণের আমানত গ্রহণ করে থাকে। এগুলো হলো চলতি আমানত, সঞ্চয়ী আমানত এবং স্থায়ী আমানত।

পাঠ-৭.৪ আর্থিক নীতি
Monetary Policy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আর্থিক নীতির সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- আর্থিক নীতির উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

আর্থিক নীতির সংজ্ঞা
Definition of Monetary Policy

একটি দেশের অর্থনীতির অর্থসংক্রান্ত নীতিকেই মূলতঃ আর্থিক নীতি বলে। অর্থাৎ যে নীতির সাহায্যে একটি দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা এবং মুদ্রার যোগান ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে আর্থিক নীতি বলে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে আর্থিক নীতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন:

আর পি কেন্ট বলেন, "পূর্ণ নিয়োগের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচলিত অর্থের যোগানের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির পরিচালনার নীতিকে আর্থিক নীতি বলে।"

আর্থিক নীতির বিস্তারিত সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক পল এইনজিগ। তার মতে, "আর্থিক ও অনার্থিক লক্ষ্যে পরিচালিত সব ধরনের আর্থিক ও অনার্থিক সিদ্ধান্ত এবং গৃহীত পদক্ষেপ, যাদের দ্বারা দেশের অর্থ ব্যবস্থা প্রভাবিত হয়, তাদের সমন্বিত রূপায়ণকে আর্থিক নীতি বা মুদ্রা নীতি বলে।" তাই বলা যায়, আর্থিক নীতি বলতে অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে নীতিকে বুঝায় এবং এর প্রধান বিষয়বস্তু হলো দেশে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক নীতির লক্ষ্যসমূহ স্থির করে এবং বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সেগুলো অর্জন করে।

আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য
Objectives of Monetary Policy

একটি দেশের মুদ্রা বা আর্থিক নীতির উদ্দেশ্যসমূহ নির্ভর করে সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। কারণ দেশের আর্থিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আর্থিক নীতির লক্ষ্যসমূহ বিবেচিত হয়। নিম্নে আর্থিক নীতির উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো:

১. **মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা:** দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্য ও সেবার মূল্য স্থিতিশীল রাখা আর্থিক নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এতে দেশের অভ্যন্তরে ভারসাম্য থাকে। এই ভারসাম্য এমন একটি অবস্থা যেখানে সাধারণ বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি থাকে না। অধ্যাপক নার্কস বলেছেন, অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বলতে জাতীয় আয়ের সেই অবস্থাকে বুঝায় যে অবস্থায় সাধারণ কর্মহীনতা এবং মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ থাকবে না।

২. **বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা:** প্রত্যেক দেশেরই বৈদেশিক বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা প্রয়োজন। কারণ বিনিময় হারের দ্বারা বাণিজ্যিক লেনদেন পরিচালিত হয়। বিনিময় হারের উপর একটি দেশের আমদানি ও রপ্তানি বহুলাংশে নির্ভর করে। আবার বিনিময় হারের ঘন ঘন পরিবর্তন অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। তাই আর্থিক নীতির আরেকটি লক্ষ্য থাকে যাতে বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকে।

৩. **বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ:** অনেক দেশেই মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা সংকোচন দেখা যায়। এ দুটোই কোনো অর্থনীতির জন্য কাম্য হতে পারে না। মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচনের সময় বাণিজ্যচক্র উঠানামা করে। বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক নীতি ব্যবহার করা হয়। এটি আর্থিক নীতির একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪. **পূর্ণ কর্মসংস্থান:** বর্তমানে আর্থিক নীতির অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো পূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। লর্ড কেইন্স বলেন, সুলভ আর্থিক নীতি এবং তার সাথে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধির দ্বারা ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতির মাধ্যমে পূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব।

৫. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** আর্থিক নীতির আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে পুঁজি গঠন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। দেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা কর্মের যোগানের সাথে অর্থ বাজারের ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব অর্থ কর্তৃপক্ষের উপর।

আর্থিক নীতির হাতিয়ার

Instruments of Monetary Policy

একটি দেশে পূর্ণ নিয়োগ অর্জন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য আর্থিক নীতির কতগুলো হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়। আর্থিক নীতির হাতিয়ার সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ:** আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার হলো মুদ্রা বা অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করা। দেশে মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে দেয়। এবাবে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়।

২. **ন্যূনতম রিজার্ভ অনুপাত:** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ জনসাধারণের নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ আমানত হিসেবে রাখে তা থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। একে রিজার্ভের হার বলে। দেশে যখন অর্থের যোগান হ্রাস করতে হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই হার বাড়িয়ে দেয়। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণযোগ্য তহবিল হ্রাস পায় এবং ঋণের যোগানও কমে যায়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভের অনুপাত হ্রাস-বৃদ্ধি করে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **ব্যাংক হারের পরিবর্তন:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সুদের হারে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ঋণ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হার বলে। একে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হারও বলা হয়। দেশে অর্থের যোগান হ্রাস করার প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার সুদের হার বৃদ্ধি করে। বিপরীত অবস্থায় হ্রাস করে।

৪. **খোলাবাজারে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়:** আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো খোলা বাজার নীতি। দেশে অর্থের যোগান বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সরকার খোলা বাজারে বিভিন্ন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণপত্র, সঞ্চয়পত্র, বন্ড প্রভৃতি ক্রয় করে। এর ফলে জনসাধারণের হাতে নগদ অর্থ বৃদ্ধি পায়। আবার যখন দেশে অর্থের যোগান হ্রাসের প্রয়োজন হয় তখন সরকার বিভিন্ন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণপত্র বিক্রয় করে। এর ফলে জনসাধারণের হাতে নগদ অর্থ কমে যায়।

৫. **নৈতিক চাপ প্রয়োগ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবক। কাজেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজনে নৈতিক চাপ প্রয়োগ করে থাকে।

৬. **প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থবাজারের শীর্ষে অবস্থান করে। তাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর উপর প্রত্যক্ষ আদেশ জারী করতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

সুতরাং, এসব হাতিয়ার প্রয়োগ করে সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ ও ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে আর্থিক নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

- যে নীতির সাহায্যে একটি দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা এবং মুদ্রার যোগান ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে আর্থিক নীতি বলে।

- আর্থিক নীতির হাতিয়ারসমূহ হলো অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ, ন্যুনতম রিজার্ভ অনুপাত, ব্যাংক হারের পরিবর্তন, খোলা বাজারে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়, ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক চাপ প্রয়োগ এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ।

ইউনিট মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থের সংজ্ঞা দিন।
২. অর্থ দ্বারা সৃষ্ট অসুবিধাগুলো কি?
৩. বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার বর্ণনা দিন।
৪. সংকীর্ণ এবং বিস্তৃত মুদ্রার সংজ্ঞা দিন।
৫. আর্থিক নীতির সংজ্ঞা দিন।
৬. আর্থিক নীতির উদ্দেশ্যসমূহ লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থের কার্যাবলী আলোচনা করুন।
২. সমালোচনাসহ অর্থের পরিমাণের ক্ষেত্রে ফিশারীয় সমীকরণটি ব্যাখ্যা করুন।
৩. সংকীর্ণ এবং বিস্তৃত মুদ্রার পার্থক্য আলোচনা করুন।
৪. কাগজী মুদ্রা কী? কাগজী মুদ্রার প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দিন। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করুন।
৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের বহুগুণ ঋণ বা আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করুন।
৭. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য সমস্যাটি কী? তারল্য সমস্যার কারণগুলো আলোচনা করুন।
৮. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।
৯. আর্থিক নীতির হাতিয়ারগুলো ব্যাখ্যা করুন।